

Vol. 40 | No. 2 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পুনর্গঠনতত্ত্বের পুনঃকথন : বাংলা কারক-চিহ্নের ঐতিহাসিক রূপভেদ প্রসঙ্গে একটি নব্য প্রেক্ষিত

Volume	40
Issue	2
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনিরুজ্জামান
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i2.1
Pages	5-20
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

পুনর্গঠনতত্ত্বের পুনঃকথন : বাংলা ঐতিহাসিক রূপভেদ প্রসঙ্গে একটি নব্য প্রেক্ষিত

Check for updates

মনিরুজ্জামান

০. 'সাহিত্য পত্রিকা'-র ৩৭/২ সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৪০০ সাল) সম্প্রসারিত ঐতিহাসিক পুনর্গঠনতত্ত্বের প্রসঙ্গে কিছু বলার চেষ্টা করেছিলাম; এখানে আরও কিছু পরিপূরক আলোচনা সংযোজন করা আমার সামান্য উদ্দেশ্য। প্রথমে সে প্রসঙ্গে একটি ভূমিকাও আবশ্যক। এই পরিসরে ভাষা-পরিবর্তন ও রৌপ-বাক্যতাত্ত্বিক কাঠামোয় গৃহীত সাম্প্রতিক কিছু অনুষঙ্গের প্রতিও লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকবে।

১. বাক্যতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বাক্যতত্ত্ব : পরিবর্তন সূত্র ও প্রক্রিয়ার নব সন্ধান

আমরা জানি ভাষা-উপাদান তিন শ্রেণীর বা এগুলি তিন স্তরে বিভক্ত। সর্বনিম্ন বা মৌলিক স্তরের উপাদান হচ্ছে ধ্বনি। কিন্তু অতীতে এবং এখনও ধ্বনিতত্ত্বের মর্যাদা কখনও পৃথকভাবে কখনও সমন্বিত রূপেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে এসেছে। এর একটা কারণ ধ্বনির মৌলিকতা ও সংগঠনকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা চলে এবং এরকম একটা দাবীও আছে। আবার একইভাবে উৎপাদনী ব্যাকরণে বাক্যপ্রসঙ্গে প্রতিরোধিত তত্ত্বের (restrictive theory) দাবীও সমধর্মী ('Syntax is regarded as autonomous.')। বর্তমানে চমস্কিয় পদ্ধতিতে 'ধ্বনি'কে চূড়ান্ত প্রকাশ বলা হলেও মূল ভরকেন্দ্র বাক্যিক উপাদানেই নিবদ্ধ। স্বাধীনভাবে বাক্যকে ও তার অন্তর্গত বিষয়াদিকে দেখার ফলে বাক্যস্বরূপী এই স্বতন্ত্র এককটির অন্বয়ন কৌশলাদি ও সমস্যা নিয়ে এ যাবৎ (ভর্তৃহরি বা তার আগে থেকে) মানুষ যে সব চিন্তা করেছে তার প্রতিফলনই হচ্ছে আজকের ব্যাকরণ এবং এর বিষয়ী বিস্তার ও ব্যাকরণী ধারণার নানা প্রসার। ভাষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদ্যাসমূহের ওপরও ফেলেছে বিপুল প্রভাব। এ ভাবে ভাষিক উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণী সত্য বাক্য চিন্তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে বস্তুত ভাষাতত্ত্বে আজ একটি বিপ্লবকেই সম্ভব করে তুলেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় কারক অন্বয়গত উপাদানসমূহ এই বাক্যতত্ত্ব ও তার সংলগ্ন এলাকারই বিষয় এবং যেহেতু বাক্যতত্ত্ব শাখার উল্লিখিত বিপ্লবী উত্থানের মধ্যে অধুনা Morpho-Syntactic চিন্তাও অন্যতম;

ফলত এখন কারক সংগঠন ও পদান্বয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিও তাই নতুন নতুন ব্যাখ্যারও যোগ্য। অতএব, এই আলোকে অত্র আলোচনার বিষয়েও ঐতিহাসিক পদ্ধতির পরিবর্তনের উল্লেখ রাখা এখানে আবশ্যক। বস্তুত, ভাষা পরিবর্তন ও তৎবিষয়ক ধারণাদির এই ঠিকানা পুনর্গঠনতত্ত্বকেও সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়েছে। যেমন কিছু কিছু পরিবর্তন ক্ষেত্রে আকস্মিক মোড় ব্যাখ্যাতীত হলেও একাধিক স্তরে তার বিভাজন (split) অনুসন্ধান নিয়ে Generative historical morpho-syntax আলো ফেলতে সক্ষম।

কারক বাক্যস্থ উপাদানসমূহেরই তথা পদসমূহেরই আন্তঃসম্পর্ক বা বন্ধন-গ্রন্থনের একটি কেন্দ্র স্থাপিত প্রকরণ। কিন্তু এর অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বর্তমানে একটা জটিল অবস্থা সৃষ্টি করে তুলেছে। অধুনা বাক্যতত্ত্বে (রূপান্তরমূলক-সঞ্জননী, প্রভৃতি) বহুরকম দৃষ্টিভঙ্গি এবং নানা ধরনের পরিভাষা সংযোজিত হতে দেখা যাচ্ছে, Linkage, Embedding, Surface, Topic-comment Principle, Syntactic weight, Relational Grammar, Binding theory, re-analysis, ECP প্রভৃতি। এ সবের মধ্য দিয়ে যেসব তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে তা বাক্যতত্ত্বের অগ্রগতির বা একটা পরিণতিরই সূচক মাত্র। সুখের বিষয় যে, এতে বাক্যের (বাক্যস্থ) অন্বয়গত উপাদানগুলির 'Historical puzzles' ব্যাখ্যায় বা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণেও তার প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। দেখা যাচ্ছে আধুনিক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে বিশেষত দ্বি-কালিক বাক্যতত্ত্বের একটা নির্ভরতা ও ভিত্তি (Ground) হয়ে উঠেছে চমস্কি উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও তার নানা প্রকরণ। (দ্রষ্টব্য, Lightfoot প্রথমে অর্থাৎ ১৯৭৯তে তাঁর Principles of diachronic Syntax-এ EST অর্থাৎ Extended Standard Theory এবং পরের দশকে তাঁর বহু আলোচনায় ও ১৯৯১তে How to set parameters : arguments from language change গ্রন্থে চমস্কির LGB-র বাইন্ডিংতত্ত্বের কিছু কিছু দিক ভাষা পরিবর্তন ব্যাখ্যায় প্রয়োগ সম্ভাবনা যাচাই করেন এবং তেমনি ইংরেজি ভাষার ইতিহাসে ওয়ারনার বা ডেনিসন প্রভৃতিকে আরও সাহসী পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় ৯০-এর দশকে।)

২. ঐতিহাসিক বাক্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের লক্ষ্য, বিচ্যুতি ও প্রসারণ ধর্ম

এভাবে বলতে পারি উপাদান-স্বল্পতা এবং আধুনিক জ্ঞানের প্রয়োগাভাব ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের বাক্য-সম্পৃক্ত পাঠভিত্তিক ধারণাগুলিকে যেখানে ফেলে এসেছিল, আজ ভাষা পরিবর্তনের আধুনিক পাঠ তাকে সেখান থেকে তুলে এনে নতুন বিশ্লেষণের সম্মুখীন করেছে। ফিলমোরের (Fillmore ১৯৬৮ এবং তার আগে ও পরে) কারক-তত্ত্বের কথা আমরা আগেই শুনেছি: ইদানিং আভ্যন্তরীণ (-তুলনামূলক) পুনর্গঠনবাদীদের ও ঐতিহাসিক বাক্যতাত্ত্বিকদের

অবস্থানও (অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে গ্রীনবার্গ, এন্ডারসন, রবার্ট কিং, এইচ. হোক, কিপারস্কি, লাইটফুট, হেনরি স্মিথ, মিলরয়, ওহালা, ম্যাকমোহন, ল্যাস ও কমরী প্রভৃতি) সেদিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এইসব তাত্ত্বিক ও পর্যবেক্ষণকারীদের অগ্রগামী আলোচনার ফলেই Generative চিন্তার অনেক প্রসঙ্গ, যেমন Transparency Principle, child's triggering experience, restructuring, verbal category, Cataclysm, lexical analysis ও Parameter resetting প্রভৃতি আজ আর ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনার বাইরে নেই এবং অনেকে এই বিশ্বাসে আশাবাদী যে এইসব নব্য চিন্তা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা বিশেষত diachronic syntax 'will explain some old historical puzzles'.

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের এইরূপে নবজন্ম ঘটলেও অপর একটি বিষয়ের অর্থাৎ এর ক্ষতিকর দিকটির কথাও অনেকে উল্লেখ করেছেন এবং তার এই অগ্রগতিকে আসলে Generative তত্ত্বে ভারাক্রান্ত 'expansionist growth' এবং মূল শাস্ত্রীয় বিধির বা তার পরিকাঠামোর পরিপন্থী মনে করেছেন। বস্তুত এতে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের বিপদাপন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই দেখেছেন তাঁরা। কিন্তু তারও চেয়ে যা সত্য তা হলো যে মাত্র সামান্য কয়েকজনের বা একটি স্কুলের মধ্যেই এই উচ্চাশাগ্রস্ত ও high quality-র মস্তিষ্ককর্ম ও অতিনব্য প্রবর্তনা সীমিত রয়েছে। অর্থাৎ এখানে রক্ষণশীলতার প্রভাবই অধিক ক্রিয়াশীল এবং সামগ্রিকতার মধ্যে ঐকমত্যের প্রকাশও বিরল (The field of historical linguistics lacks unity.)। আমরা চল্লিশের শেষেও দেখেছি যে হোয়েনিগসওয়াল্ডের পুনর্গঠনতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ড. মেহেন্দেলের বিরুদ্ধ যুক্তি ও আন্দোলন ছিল যথেষ্ট প্রবল; আবার সত্তরের দশকে ড. ভাট নিয়মিত (Regular) ও বিচ্ছিন্ন (Sporadic) পরিবর্তনকে ধ্বনিপরিবর্তনের উৎপাদনী সূত্র থেকে যখন ভিন্ন করেন এবং কেবল ধ্বনিপরিবর্তন সূত্র (rule of sound change) দ্বারা তা ব্যাখ্যাযোগ্য মনে করেন নি তখন এই যুক্তির পক্ষে তাঁকে একাই দাঁড়াতে হয়েছিল। অবশ্য এখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

এই বিতর্ক ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনার নব্য ধারাকে বিনষ্ট করে না বরং ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের এই নবজন্মলব্ধ উজ্জীবিত শাখাটি যে খাপ-খাওয়ানো স্বভাবী ও প্রসারণধর্মী তাই প্রমাণিত করে। প্রাচীনেরই পুনঃ আবিষ্কার ঘটেছে এবং তার নবমূল্যায়ন ঘটেছে এ ভাবে। অতএব এই বিস্তৃত আলোচনার প্রতিটি বিক্ষেপনে ভাষা বিবর্তনের ব্যাখ্যাটিই যে মূল লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই।

৩. ভাষা বিভাজনে কারক-চিন্তার প্রসার ও নব পরিভাষা সৃষ্টি

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব-চিন্তার ভিত্তি হচ্ছে 'ভাষা পরিবর্তন' ও তার শ্রেণীরূপ বিশ্লেষণী দর্শন। উনিশ শতকেই শ্লেইখার (১৮৬১), স্মিথ (১৮৭২) প্রভৃতির ভাষা শ্রেণীকরণ ও পরিবর্তন বিশ্লেষণের ধ্রুব আদর্শ (classical model)-গুলি উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বে বিংশ শতকেও এ চিন্তা থেমে থাকে নি; বিশেষত ব্যাকরণী বৈশিষ্ট্যের (টাইপলজিকাল) দিক থেকে শ্রেণীকরণের এই প্রয়াস বর্তমান অবধি বিদ্যমান। ক্রোয়েবার ও শ্রেতিয়েনের 'পরিসংখ্যান তত্ত্ব' (১৯৩৭; মার্কিনী তাত্ত্বিক মরিস সোয়াদেশ উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও প্রকরণ থেকে এগিয়ে ১৯৫৮তে যিনি আবারও নিজের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং এ প্রসঙ্গে তাঁর উত্তরাধিকারী জোহানা নিকোলাসের সাম্প্রতিক 'Population typology-র কথাও উল্লেখ্য), পোরজিগ-এর প্রত্ন-বিশেষত্ব প্রবাহ রক্ষা ও অংশীভূত নবায়নতত্ত্ব (১৯৫৪-৫৭), ষাট দশকের বিপ্রতীক ও সংযোগগত সমবিন্দুক পরিবর্তনতত্ত্ব, ওয়াটকিনসের নঞর্থভাবিত ও সংযোগ বিস্মৃত নবায়ন তত্ত্ব, ১৯৬৬; negative innovation), মীডের স্থানকালদূরত্ব জ্ঞাপনী পিরামিডতত্ত্ব (Meid 1975), এবং অধুনা আলোচিত কৃষ্ণমূর্তি, সোসেস ও ডানফোর্থের মন্থর ধ্বনিপরিবর্তন সূত্র (১৯৮৩) প্রভৃতি সেই প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি। এইসব তত্ত্বের অন্যতম লক্ষ্য ভাষাবর্গীকরণ বা ভাষা বিভক্তি রহস্যভেদ হলেও বোঝা যায় যে এর কেন্দ্রীয় বিষয়টি ভাষা উপাদানসমূহের পারস্পরিক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া বিচার যেখানে কারকের গঠন ও চিহ্ন ব্যবহার প্রশ্নটি অবধারিত। প্রত্যয়াদি ব্যবহারী ভাষার এটাই একটা মৌল প্রপঞ্চ বিশেষ। এই ভাবেই ওয়াং, লিয়েন ও মিলারস ভাষা পরিবর্তনের দ্বিমুখী (bidirectional) বিস্তার ও সামাজিক উৎস (Social source) তত্ত্ব উপস্থিত করেন (তাঁদের একটি উক্তি দ্রষ্টব্য: 'Contact may create two symbiotic varieties with change subsequently diffusing bi directionally.') এবং অপরাপর ভাষাবর্গীকরণ তত্ত্ব থেকে তাঁদের চিন্তার পার্থক্যটি এই যে ব্যাখ্যায় তা সমকালের বোধগুলিতে যেমন ধারণ ও অধিকতর স্পষ্ট করতে সক্ষম, তেমনি তা তথ্যস্থাপনায় ও পারিভাষিক ঐশ্বর্যেও ঋদ্ধ। বস্তুত এই সব তত্ত্বে ভাষায় নির্দিষ্ট এককসমূহের কারকী ব্যবহার বা অন্বয়গত পরিবর্তনের ঐতিহাসিক সূত্রেরও ব্যাখ্যা জানা যায়। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিকদের নবম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (লস এঞ্জেলস ১৯৮৯) কেরল চাসকির আলোচনাটির কথাও উল্লেখ করা যায়; তিনি কারক পরিবর্তনে ও সূত্র বিবর্তনে বাক্যতাত্ত্বিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সংযোগ ব্যাখ্যা করে মৌল স্তরের (underlying level) গঠনকে নির্দেশ করেছেন। এই সব আলোচনায়

তাই প্রচুর নব পরিভাষার সংযোগও লক্ষ্য করা যায় (surface change, diffusion or resetting across a community, lexical feature, loss of impersonals (সম্প্রদান কারকে), parameter loss ইত্যাদি। কারক সমস্যার ক্ষেত্রে কেরল চাসকির একটি উক্তিও এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: 'The change can be described as an increased preference for a certain type of case assignment.' (ঐ)

আমরা জানি ব্যাকরণে (সাধারণ) নামপদ বা বিশেষ্যের সাথে অব্যবহিত উপাদান স্বরূপে সম্বোধন, সম্বন্ধপদ ও কারক-অনুসর্গ শ্রেণীর গ্রন্থনা ছাড়া ক্রিয়ান্বয় বা যৌগ ক্রিয়ান্বয় বড় ধরনের এক সংগঠন। নানা ভাষায় এদের অন্বয়-সংস্থান বা গঠন প্রকৃতি নানা প্রকারের। উল্লেখ্য যে, ভাষায় প্রকাশধর্ম অনুযায়ী এগুলিরই সাথে ঘটে কারক-সম্পর্ক। কিন্তু সে প্রশ্নে যাবার আগে বলা আবশ্যক যে ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে বর্গীকরণ ক্ষেত্রে অন্বয়রীতি এই বৈশিষ্ট্যগুলি সহায়ক সূত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ পদক্রমঘটিত অন্বয়ী ব্যবস্থার এই বহুধা সম্প্রসারণ ও প্রকরণ বৈচিত্র্য (typological features) শুধু ব্যাকরণিক ও বাক্যিক গ্রন্থনারই বিশেষ রূপ নয়, ঐতিহাসিক তথ্য বিচারেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৪. কারক-বিভক্তি প্রয়োগের সাধারণ প্রকৃতি

কারক-বিভক্তির বিকাশ ধারা ও পরিবর্তন থেকে ক্রিয়ারূপের অন্বয় ধারণ শক্তি, পদের অবস্থান-ধর্ম, উপসর্গাদির কারক-উপাদানে রূপান্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যাকরণী বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন ইন্দো-ইউরোপীয় বহু ভাষার ক্ষেত্রে সম্বোধন (Vocative) পদ/কারকের রূপ কর্তৃকারকের রূপের বা রৌপ বৈশিষ্ট্যের সাথে নিরপেক্ষতা অর্জন করে বা আংশিক একীভবনের (Partial syncretism) রূপ লাভ করে। এইভাবে ষষ্ঠী (genetive) ও ৪র্থীর (dative) একরূপীজ্ঞান কোথাও শুধু সর্বনাম ভিন্ন শব্দরূপে আবার অধিকন্তু কোথাও অধিকরণ রূপের সাথেও এসে একাকার হয়েছে। বিভক্তির এই সমাকরণ ইউরোপ থেকে ভারতীয় আর্য ভাষা পর্যন্ত একটি সাধারণ ধর্ম। শেষোক্ত এই একীভবন প্রক্রিয়াটি প্রসারিত হয়ে আর্মেনীয় প্রভৃতি ভাষায় কর্তৃপদের এক বচনের ও কর্মকারকের (accusative) বহুবচনের রূপের মধ্যেও বিস্তৃত হতে দেখা গেছে। এই প্রক্রিয়া Ergative ভাষারও একটি বৈশিষ্ট্য। বাংলা ভাষা এই বৈচিত্র্য-রেখা স্পর্শ করেই আছে। অর্থাৎ এখানেও বিভক্তি সংকোচনের উদাহরণ ও অন্বয় ধর্মের সংক্রামণ প্রকৃতি অপ্রতুল নয়। চর্যাপদে সকর্মক

ক্রিয়ারূপে প্রাতিপাদিক রূপ ঐচ্ছিক ছিল, যা পুনর্গঠনতত্ত্বে একটি তথ্য হিসাবে মূল্যবান। আবার দেখি বাংলা বিভক্তি স্থলে ও বিভক্তি উত্তরপদে অনুসর্গ ব্যবহার ('তোমার আগে') রীতি আধুনিক বাংলায় নেই অথচ উপভাষায়, বিশেষত প্রান্তীয় উপভাষায় এটি একটি প্রচলিত রীতি। এখানে সংযোগ তত্ত্বই ক্রিয়াশীল। চর্যাপদ (সুখদুখেঁতে) ও মধ্যযুগের দুই একটি ক্ষেত্রে ক্বচিৎ এর ব্যবহার দেখা গেলেও (pleonastic form) আসাম সীমান্তে ও কামরূপী উপভাষায় ষষ্ঠীবিভক্তির সঙ্গে এইরূপ যুক্ত ব্যবহার রক্ষিত; অন্যান্য বিভক্তির ক্ষেত্রগত প্রসার পরকারকায়ন বা (পরকায়ন) এর একটি নবায়নকৃত বৈশিষ্ট্য।

৫. ইন্দো-ইউরোপীয় তথা ভারতিক ভাষায় কারক বিভক্তির স্বরূপ

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে কারক বৈশিষ্ট্যের অপরাপর বিবর্তনের বিশেষ কয়েকটি তথ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সংস্কৃতে ও বৈদিকে কারকের সংখ্যাগত পরিচয় প্রায় একই ছিল (৬+২), কিন্তু গুণগত কিছু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল তার মধ্যেই। অর্থাৎ ছয়টি নিয়মিত কারক (নির্দিষ্ট বিভক্তি রূপ ও তার সহরূপ-বৈচিত্র্য নিয়ে) ছাড়া দুটি পদ কারকস্থানীয় বৈশিষ্ট্য পায়। বিভক্তি ক্ষেত্রেও স্বরান্ত্য ও ব্যঞ্জনান্ত্য গঠনে এবং লিঙ্গ-বচনাদি ভেদে বিভক্তিরূপের পার্থক্য সূচিত হয়। অবশ্য প্রাকৃতিক স্তরে নেমে এই বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্যতা হ্রাস পায়। যেমন, বৈদিকে কারক অনুষঙ্গের প্রভাবে অনিয়মিত কারকের ব্যবহার ও কারকপদের পৌনঃপুনিক গঠন স্থলে সমাজ সিদ্ধ পদ হতো, সংস্কৃতের স্তরে এসে তার পরিবর্তন ঘটে। কর্তৃ ও কর্মকারকের এক বচনে প্রশ্নবোধক সর্বনাম প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ধ্বনি বিবর্তনসূত্র অনুযায়ী হতো (যথা, চ স্থলে ক, অর্থাৎ আবেস্তা, মা-চীস সংস্কৃত, মা বি:), সংস্কৃতে এই রূপমূল গঠনে তীর্যক কারকের গঠন সাদৃশ্য ও প্রভাব সুস্পষ্ট। বৈদিকে ব্যঞ্জনান্ত্য গঠনের প্রসার ছিল এবং দ্বিবচনের নির্দিষ্ট বিভক্তি ছিল (তুং, গ্রীক এবং বালতো-স্লাবিক), কিন্তু সংস্কৃতের স্বরান্ত্য গঠন এবং বচনের ক্ষেত্রে সংকোচন-রীতি কারক-চিহ্নের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। মধ্যযুগে কারকের সনাতন সংহতিমূলক রূপ ভেঙে পড়ে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্র মধ্যভারতীয় ভাষার প্রভাব সংস্কৃতে ছাপ রেখে যায় বা এর পুনঃস্থাপন ঘটে (মহ্যম/মমকৃতে উভয় রীতির ব্যবহার দ্রষ্টব্য)।

এই তালিকা অবশ্যই আরও দীর্ঘ, তবে কারক চিহ্নাদি উদ্ভবের বহু বিচিত্র ধর্মের একটি তৌলন চিত্র ও পুনর্গঠনতত্ত্বে এর সংযোগ ও সম্পর্ক (relevance) এ থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায় এবং তাতে এখন লক্ষ্য করতে পারি যে এর ভেতর

একটা ব্যাপক স্বেচ্ছাকৃতি (আপাত) ও যথেষ্ট প্রভাব-মিশ্রণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। যেমন ইন্দো-ইউরোপীয় প্রায় ভাষাতেই কারক-সংখ্যা অনিশ্চিত (সর্বোচ্চ ৮ এবং সর্বনিম্ন তুখরীয় ভাষাতে ২; তবে বোধ করি মান-সংখ্যাটি মোটামুটি ৫ বা এর কাছাকাছি যা লাতিনীয়, জার্মানী ও অধিকাংশ ভারতীয় আর্য ভাষায় লভ্য)। দ্বিতীয়ত, সম্বোধন কারকের স্বতন্ত্র কারক চিহ্ন প্রায় সর্বক্ষেত্র অনুপস্থিত (কয়েকটি গ্রীক শব্দরূপে এর ব্যতিক্রমের কথা জানা যায় মাত্র)। বস্তুত ইন্দো-ইউরোপীয় নামীয় এই মহা ভাষাবংশের সর্বত্রই বিশেষ বাক্যতাত্ত্বিক রূপ থেকেই সম্বোধন পদের অন্বয়ী প্রকৃতিটি বোঝানোর জন্য একটি প্রক্রিয়া গড়ে উঠেছে। তাই মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় বিশেষত অশোক পরবর্তীকালে সম্বন্ধ ও সম্প্রদান কারক চিহ্ন নিরপেক্ষ হয়ে যায় এবং দুই-এর রূপই উভয়ক্ষেত্রে সম্বন্ধ দ্বারা সূচিত হতে থাকে। এই রকমভাবে genetive-dative মিশ্রিত হয়ে কোথাও আবার আরও একস্তর রূপান্তরে এগিয়ে গেছে (পূর্বে আর্মেনীয় ভাষায় যেমন লক্ষ্য করেছি)। এই সব প্রক্রিয়ার উপরিস্তরী ফলদায়ক পরিণতি শুধু একটাই, একীভবন হেতু কারকের পরকায়ন, চিহ্ন সংখ্যা হ্রাস এবং নিরপেক্ষ ও তীর্যক ব্যবহার।

৬. ভারতীয় আর্য ভাষার বহুস্তরী বিবর্তন

প্রচলিত ব্যাকরণে কারক বলতে বোঝায় এইগুলি, যথা- কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। কারক এক ও বহুবচনে সিদ্ধ। অর্থাৎ 'আমি/আমরা যাই' এই উভয়ত: কর্তৃকারকের সম্পর্ক অটুট। এইভাবে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষে এবং বিশেষ্য ও সর্বনামে কারক হয়। কিন্তু বিশেষ্যের পদরূপ এবং ক্রিয়ার ধাতুরূপের পরিবর্তনও কারক সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। যেমন-

	একবচন	বহুবচন		
উত্তম পুরুষ	আমি	আমরা	+	(ক্রিয়া
মধ্যম পুরুষ	তুমি	তোমরা		এবং ক্রিয়ারূপ)
প্রথম পুরুষ	সে/বালক	তারা/বালকেরা		

পূর্বরূপ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই সাধারণ ছকটি তাই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হয়ে ওঠে। অন্তর্তল ও উপরিতলের রূপ ভিন্নতা, প্রতিতল এবং ধ্বনিসূত্র প্রভৃতি ও বাক্যতাত্ত্বিক কিছু স্থাপনা এই বাস্তবতার পেছনে ক্রিয়াশীল। ব্যাখ্যাটি অবশ্যই জটিল। কেননা সরল একরৈখিক ও এক-এক সম্পর্কসূত্রে ভাষারূপের ছেদ, বিভাজন ও অন্বয়গত ও অন্যান্য বাস্তব রূপ লাভ ঘটে না এবং সব ভাষাও কিন্তু এক রকম হয় না। অতএব এর ভেতর শব্দ বা পদের যেমন

নানা পরিবর্তন ও স্থান বদল হয় তেমনি বিশেষ বিশেষ ভাব ব্যাপক ক্ষেত্রে অর্থসংক্ষেপ বা অর্থ বিস্ফারণের সুবিধায়ও এই ছকের পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন প্রত্ন-বাংলা স্তরে একবচনের ঘরেই হঁউ/মই বা সো/সেঁ প্রভৃতি পাওয়া যায়। কিংবা আধুনিক বাংলায় "আপনি/তিনি যান" এইরূপ বাক্যে কর্তায় মধ্যমপুরুষ (আপনি) ও প্রথম পুরুষ (তিনি)-এর মধ্যে স্থান বদল হতে দেখা যায়। ('the shapes of the honorofic inflectional endings are modeled on earlier IA plural inflection at markers') ইতিহাস সন্ধান করলে দেখা যাবে উত্তমপুরুষের মধ্যে বাচ্য ভেদটি সর্বপ্রাচীন, অন্যান্য পুরুষে সেগুলি আগেই প্রভেদ ঘুচিয়ে সরল হয়ে গেছে এবং বহুবচনেও তা প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে।

আদি ভাষারূপে বা মূলে কারক রূপের ও কারক ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যটি পুনর্গঠনতত্ত্বের আলোকে লক্ষ্য করলে সম্পর্কসূত্র ও বিবর্তনের তথ্যগুলি স্পষ্ট হবে।

ইন্দোইউরোপীয় ভাষায় আরও (৬+) দুই প্রকার কারক ছিল অর্থাৎ মোট কারকের সংখ্যা ছিল আট (৮)। এই দুইটি হলো সম্বন্ধ এবং সম্বোধন। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষাতেও তাই। কিন্তু পরবর্তীকালে যেমন অশোক লিপিতে প্রাপ্ত ভাষারও পরে (মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায়) "বুদ্ধায় নম:" স্থলে একটি (সম্বন্ধ) পদ দ্বারা যুক্ত হয়ে ভাবটা প্রকাশ হতো এভাবে: বদ্ধস্স নমো। এতে দেখা যায় সম্প্রদান ও সম্বন্ধ এক হয়ে পড়েছে।

এইভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার (OIA) কারকের ক্ষেত্রে অন্তত: তিন বা চার ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় :

১। সম্প্রদান ও সম্বন্ধ উভয়ই সম্বন্ধ পদ দ্বারা সূচিত হতো (ওপরে বর্ণিত)। পালিতে সম্প্রদানের চিহ্ন বিশেষ মিললেও পরে সম্বন্ধপদ দ্বারা বা সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছে, যেমন: সং মোহায় > মাহা, আমামোহাঅ।

২। তিন বচনের স্থলে দুই বচন (এক-এবং বহুবচন) ব্যবহৃত হতো (দ্বি-বচনের লোপ তথা দ্বি-বচনের স্থান বহুবচন কর্তৃক অধিকার, যথা: দ্বৌ ময়ূরৌ > দুবে মজুলা।)*২

৩ (ক)। কারকগুলির সংহতিমূলক (Synthetic, যেমন সংস্কৃতে) গঠন ভেঙ্গে সাদৃশ্যে কারক গঠনের প্রবণতা দেখা গেল। একে বলা যাক বিশ্লেষণমূলক। ড. শহীদুল্লাহ্‌র মতে এই বিশ্লেষণমূলক কারক পালির পর আরম্ভ হয়। এতে কর্তা-কর্ম ছাড়া কারকে বিশিষ্ট শব্দের ব্যবহার হতো, যথা, তেন > তেন সহ, তেন সার্থম ইত্যাদি (তৃতীয়ার সাথে পৃথক সহবোধক শব্দ যোগ)।

এখানে আরো একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। এ পর্যায়ে বৈদিক ও সংস্কৃত প্রায় একই সময়কার ভাষা হলেও বীমস সাহেব ও অন্যান্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিশেষজ্ঞগণ এটা স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করেছেন যে এই দুই ভাষার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বিশেষত বৈদিকে যা নেই বা প্রত্ন-বৈদিকে যা ছিল তাও যেমন সংস্কৃত ভাষা ধারণ করেছে, তেমনি বৈদিক পরবর্তী এবং মধ্যযুগের (MIA) ভাষার বহু লক্ষণ বা প্রভাবও এ ভাষায় স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে। (প্রসঙ্গত বীম্‌স সাহেবের তুলনামূলক ব্যাকরণটির [বীমস, ১৮৭১] ভূমিকাংশের দ্বিতীয় অনুধ্যায়ে 'Aryan, though not Sanskritic' কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর উক্তিগুলি মনে করা যেতে পারে।) এ ভাবেই দেখা যায় :

৩ (খ)। OIA ভাষার রূপ 'মহ্যম', সংস্কৃতে হয়েছে: মহ্যম/মমকৃতে। এটা সম্পূর্ণত: MIA ভাষার প্রভাবের ফল।

৪। অ-কারান্ত শব্দে একবচনে লিঙ্গ ভেদে কারকরূপের ভেদ হওয়ার নিয়মও অন্তত কর্তৃকারকে শিথিল হয়, যেমন, মৃগ: > মিগে (পুং) এবং ধনম্ > ধনে (ক্লীব) এই উভয়ত এ-বিভক্তি প্রচল হতে দেখা গেছে।

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার (MIA) কারকের পরবর্তী পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ :

১। বৌদ্ধসংস্কৃতে উপরোক্ত সম্বন্ধপদ বা পদচিহ্নস্থলে কৃত (কখনও 'কার্য') শব্দ যোগে কারক নিষ্পন্ন হতো, যেমন সং উদ্যানস্য আসনম্ > বৌ. সং. উদ্যানকৃতং আসনম্ ইত্যাদি।

২। বিশেষ্য ও সর্বনামের বিভক্তি রূপ ক্রমশ একরূপ হয়। বচনের ভিন্নতাও প্রায় নেই, বহুত্ব বোঝাতে বিশিষ্ট শব্দ সমাসরূপে যুক্ত হতে শুরু হয় মধ্যযুগের অন্তিম পর্যায়ে: যেমন- পন্ডিঅলোঅ।

৩। তিনটি লিঙ্গে কারক বিভক্তিগুলি একরূপ প্রাপ্ত হতে থাকে। অর্থাৎ পুংলিঙ্গ-ক্লিবলিঙ্গের ভেদ লুপ্ত হয়ে আসে, যেমন: নরা: > নরা, নরান্ > নরা, এবং ফলানি > ফলা। প্রথমে সংখ্যায় ও পরে ক্রমশ সর্বনামে তিন লিঙ্গের বিভক্তি রূপ সবই প্রায় একাকার প্রাপ্ত হয়। বিশেষ্য-বিশেষণেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় অতঃপর।

৪। MIA-র শেষ পর্বে বিভক্তিসমূহের নতুনরূপ গড়ার প্রয়োজন দেখা দিতে থাকে। যেমন, কারক-অব্যয়ের ব্যবহার (অশ্বাৎ > ঘোড়াত, ঘোড়াত হইতে > ঘোড়া থেকে)।

৭. বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ভারতিক শাখার পূর্বভারতীয় রূপের একটি নব্য বিকাশ (৭ম শতক)। অসমিয়া ও ওড়িশি ভাষা এর সহোদরা অন্য দুই রূপ। মাগধী, মতান্তরে গৌড়ীয় প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্যজাত এই ভাষা একদিকে অপভ্রংশ কালের প্রাচীন লক্ষণ ও অন্যদিকে নব্যকালের ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যাদির মিশ্রণ (Shared Innovation) নিয়ে গড়ে ওঠে। M.H. Klaiman বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে বলেন, 'The most noteworthy of these features is the absence of gender, a grammatical category found in most modern Indo-Aryan languages. Bengali and its close relative Assamese also lack number as a verbal category.' আসলে কালের প্রবাহে এ ভাষা যে রূপ লাভ করে সেখানে সংস্কৃত স্তরের সংশ্লেষণধর্মিতার ক্ষয় এবং বিশ্লেষণধর্মিতা প্রতিষ্ঠাযুক্ত হয়। তখনই ব্যাকরণী নিয়মের সূত্র ও সম্পর্ক অনুক্রমে (Relative chronology) পরিবর্তন ও ব্যাখ্যায় লক্ষ্যযোগ্য হতে থাকে এবং বহু নবায়ন ঘটে। এভাবে কারক বচন কাল ও (কর্ম) বাচ্য রূপের তদ্ভবায়ন বিশিষ্ট আকৃতি পায়। এ পর্যায়ে প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় কালের বৈশিষ্ট্যও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ স্থিতি লাভ করে, (Shared Retention) এবং প্রাচীন দ্রাবিড় মুণ্ডাদি ভাষার অবশিষ্ট রূপের একটা sub-stratumও রচনা করে। এই ভাষার প্রাচীনরূপে হিন্দী (বা হিন্দকী)-সহ কোনও বিদেশি ভাষার সংস্পর্শতা নেই, তবে অন্বয়রীতিতে হিন্দী প্রভৃতি অপর ভারতীয়, আর্য ভাষাদির সাথে মিলও অলভ্য ছিল না (যেমন, সম্বন্ধ পদে সম্বন্ধীয় পদে লিঙ্গানুসরণ, কখনও সকর্মক ক্রিয়ারূপে কর্মের স্ত্রীলিঙ্গ কিংবা অকর্মক ক্রিয়ায় অতীতকালের কর্তার স্ত্রী লিঙ্গী প্রত্যয়ের প্রভাব ইত্যাদি)। সর্বনামরূপে প্রথম পুরুষের রূপ 'সো' শব্দের বহুবচনে প্রত্ন এবং পূর্বস্তরীয় ('তানি-') রূপের বিবর্তন ('তিনি')-রূপকে আদর্শ করে ব্যাকরণী পরিবর্তন আনা হয়, অর্থাৎ পূর্বস্তরের বহুবচনীরূপ আধুনিক স্তরে একবচনের স্থায়ী রূপে পরিণত হয়, যেমন একইভাবে 'আমি' এবং 'তুমি' বহুবচনের রূপ হওয়া সত্ত্বেও (<আহ্মে, তোহ্মে) একবচনে এদের স্থানবদল ঘটে এবং গৌরবার্থ রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। বস্তুত এইরূপে সর্বনামের এই নানাভেদই ক্রিয়া বিভক্তিরূপে বিশ্লিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোথাও ধ্বনিপরিবর্তনের সাধারণ সূত্র যথা স্বরসঙ্গতি (দাদি>দিদি ইত্যাদি), কোথাও সাদৃশ্য ও সংক্রামণ মাত্র অনুসরণে ভাষারূপের সরলীকরণ সিদ্ধ হয়েছে। কারক চিহ্ন বা বিভক্তির ক্ষেত্রেও মিশ্রণ, একীভবন ও তির্যক ব্যবহারের যে

ঐতিহাসিক তথ্য পাই reflexes-এর সাথে পূর্বরূপের সংযোগ বৈচিত্র্যগত ব্যাখ্যাই দাবী করে। পূর্ববর্তী স্তরের আলোচনায় আমরা তা লক্ষ্য করেছি।

৮. বাংলা কারক-বিভক্তি

বাংলা কারকে লুপ্ত বিভক্তি, প্রাতিপাদিকের উত্তররূপ (reflex) বা বিভক্তি-সমতা প্রভৃতি পরিবর্তন ধারার এবং সংযোগ অনুক্রমেরই বহু চারিত্রিক প্রকাশ। সংক্ষেপে এখানে কেবল কর্তৃপদের বিভক্তিগুলির উদ্ভব ও বিকাশ তথ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো, কেননা এখানেই স্বচ্ছতাতত্ত্বের নীতিগুলি সম্পর্কে আমাদের ধারণাও স্পষ্ট হবে এবং পুনর্গঠন স্তরে প্রত্যয় ও শব্দ-প্রান্তগুলির বিকল্প গঠন ও রূপান্তরগুলির সাপেক্ষতা-নিরপেক্ষতা ভেদে শ্রেণীকরণও একটা বোধগম্য অবয়বেই দেখা সম্ভব হবে। বাংলা কারকের একটা স্বরূপ তার স্ব-চরিত্রের পরকায়ন এবং বহুচারিত্রিকতা। এখানে অবস্থান স্বরূপ ও মর্যাদাভেদে প্রত্যয়ন্ত পদে সন্ধি নিয়মের ধীর অভিক্রম ও তাৎক্ষণিক সংক্রামণ দুয়েরই প্রকাশ বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য। অপরকারকাগত প্রভাব ও অনিয়মিত উদ্বর্তনও এখানে বিকল্প স্বরূপ। ইতিহাসের বাঁকে প্রবিষ্ট নব্য প্রবণতাজাত এই সব পরিবর্তন ও নবায়ন পরি-উত্থিততল (Surface) ও প্রেক্ষিত তল (deep struetur) উভয়ই এক বাস্তব ঘটনার প্রবাহমাত্র। এতে কখনও সাদৃশ্য, কখনও পুনঃসর্জন (re-setting), কখনও প্রাদেশিকরণ বা কখনও বহুবঙ্গকীকরণ, আবার কখনও তদ্ভবের অপ্রচলন বা প্রতিসরণ ও ঋণায়ন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ারই অংশ হয়ে উঠেছে। এ ভাবেই হয়েছে এর সাংখ্যিক সংকোচন ও গুণগত সম্প্রসারণ বা আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। এখানে এমন কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যায়। যেমন- প্রাতিপাদিক গঠন, নির্দিষ্ট পদক্রম বা পদসংস্থান এবং বাচ্য বিশেষ ক্ষেত্রে বিভক্তি অপালন, নামপদ ও নাম বিভক্তির নতুন অর্জন, অনুসর্গরূপ ক্রিয়ার ব্যবহার ('গিয়া দেখ' বনাম 'দেখ গিয়া' ই: OV → VO পরিবর্তন), সর্বনামে বহুবচনের সর্বনামায়ন ('আপনি') ও গৌরবায়ন ('আমি', হঁউ স্থলে), প্রাতিপাদিক প্রভৃতি স্থলে স্ত্রী প্রত্যয় যোগ ইত্যাদি। তবে এখানে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়টি তির্যক কারকের রূপ ও ব্যবহার, যথা 'মই' (করণ কারক-রূপ), 'মই দেখিল' (কর্মভাববাচ্যে কর্তারূপ, মূল 'ময়া দৃষ্টম' রূপাগত), এবং চর্যাগীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন (Catastrophy?) : 'জাসে কাম' (জন্ম হইতে কর্ম), 'ডোম্বিত আগলি' (ডোমনীর আগে বা ডোমনীর বাড়া) প্রভৃতি, যেখানে প্রয়োগমূলে অপাদানার্থে অধিকরণ বিভক্তির বিস্তার দেখি। এই পরিবর্তন কারকেও ক্রিয়ার কাল চিহ্নস্বরূপেও, তাই শ্রটাই-বাংলা ভাষার নিজস্ব ধর্ম, এবং সুকুমার সেনও তাই মন্তব্য করেন।

'চর্যাগীতির ভাষা যে মূলত বাঙ্গালা তাহা সম্বন্ধ [-এর], অতীত [-ইল], এবং ভবিষ্যৎ [-ইব] বিভক্তি দ্বারা এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট ইডিয়ম হইতে প্রতিপন্ন হয়।'

বিভক্তির একীভবন বা সমাজীকরণ বা বিস্তারে সর্ববিধ কারকে বিশেষচিহ্নের সমরূপকেই তির্যক বলে। ঐতিহাসিক সমন্বয়ী পরিবর্তনের ফলে ও প্রভাবের কারণে এই রূপান্তর ঘটে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বাচ্যের রূপবদল ও ক্রিয়ার নিরপেক্ষ ধর্ম কারক-চিহ্নের ওপর প্রভাবক স্বরূপ ছিল। বাংলা ভাষার ক্ষেত্র কারক-চিহ্নের রূপভেদ অপেক্ষা রূপৈক্য ও প্রাতিপাদিক ধর্মই বলশালী এবং অন্বয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও সকর্মক-অকর্মক (ক্রিয়াগত) রূপভেদ এবং গৌণকর্ম-মুখ্যকর্ম রূপবৈচিত্র্য বিভক্তি-চিহ্নের অপর সাধারণ সূচক। এক সময় লিঙ্গ ও কারক-বিভক্তি ক্রিয়া বিভক্তির অনুগামী হতো।

কর্তৃকারক

কর্তৃকারক ।। এই কারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। এইগুলি বর্তমানে এ, য়, তে এবং শূন্য বা লোপ।

আমরা লক্ষ্য করেছি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় (OIA) লিঙ্গভেদে কারকচিহ্ন নির্দিষ্ট হতো। অর্থাৎ একই কারকে পুংলিঙ্গে যে বিভক্তি হতো স্ত্রী লিঙ্গে বা ক্লীবলিঙ্গে সে বিভক্তি হতো না। উল্লেখ্য সংস্কৃতে সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গে কোনও বিভক্তি চিহ্ন থাকতো না।)

অশোকের প্রাচ্য অনুশাসনের সময়ে এসেই দেখা যায় শুধু স্ত্রী-লিঙ্গের কারক চিহ্নই আলাদা থাকছে। অর্থাৎ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয় স্থানেই এ বিভক্তির ব্যবহার-সমতা সৃষ্টি হয়েছে।

পরে এর আরো পরিবর্তন হয়। একবচনে 'বিকল্পে' শূন্য বিভক্তি বা বিভক্তি লোপ হয়। এই বৈশিষ্ট্যকে তখন আমরা মাগধী প্রাকৃতের অন্তর্গত বলতে পারি। প্রাচ্য অপভ্রংশ ও প্রাচীন (এবং আধুনিক) বাংলা ভাষায় শূন্য বিভক্তির ব্যবহার এইভাবে এসেছে।৩ অর্থাৎ, বাংলায় সাধারণত কর্তৃকারকে বিভক্তি চিহ্ন থাকে না, তা চর্যাপদেও (কাহ্ন বিমনা ভৈলা), এখনও।

(ক) শূন্য (০) বিভক্তি : এই বিভক্তির উৎপত্তি বিষয়ে মতভেদ থাকায় বিশদ আলোচনা আবশ্যক। ড. সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে শূন্য বিভক্তি প্রাচীন বাংলার নিজস্ব জিনিষ। অতএব সং পুত্রঃ (কর্তৃকারকের বিসর্গ চিহ্ন) > মাগধী প্রা পুত্তে > অপ. পুত্তি > প্রা. বাং. পূত > পুত হয়েছে। এই মত মেনে নিলে আমাদের ওপরের ব্যাখ্যা সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু ড.

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ব্যাখ্যা গ্রহণ করে আমরা দেখাতে পারি বিভক্তি লোপ আরও প্রাচীন ব্যাকরণ-সিদ্ধ, যদিও তা নিয়মিত (Regular) বা নিয়মসিদ্ধ ছিল না। অবশ্য, বৈকল্পিক (free variation রূপ) ব্যবহারও ব্যাকরণের একটি সূত্র।

ড. শহীদুল্লাহ্‌ বররুচির ব্যাকরণ থেকে এই বিকল্পসূত্রটির সপক্ষে প্রমাণপঞ্জী উপস্থিত করেছেন। এতে দেখা যায় বিভক্তি লোপ ব্যাপারটি OIA ভাষাতেও কর্তৃকারকের একবচনে ক্লীবলিঙ্গ শব্দে একেবারে অজানা ছিল না, বিশেষত অ-কার ছাড়া অন্য স্বরান্ত শব্দের ক্ষেত্রে। যথা, বারি, মধু (শেষে বিসর্গহীন এবং ই/উ স্বরধ্বনিযুক্ত) ইত্যাদি। এই ব্যাপারটি পরে কর্তৃকারকে পুংলিঙ্গের (বিভক্তি ছাড়া হলে) রূপের সাদৃশ্যে নিয়মিত হয়ে উঠতে থাকে এবং এভাবে এই নিয়মিত বিভক্তিহীন ক্লীবলিঙ্গরূপের সাদৃশ্যে পুংলিঙ্গরূপেরও পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। অর্থাৎ উভয় লিঙ্গের রূপের প্রভাবে (সাদৃশ্যে) উভয়ত সমরূপতা ঘটতে থাকে। অশোকের প্রাচ্য অনুশাসন লিপিতে আমরা লিঙ্গচিহ্নের যে সমরূপতা লক্ষ্য করি এ তারই উজ্জল দৃষ্টান্ত। (অর্থাৎ অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গের ও পুংলিঙ্গের কর্তায় একবচনে এ-কার হওয়া, যেমন 'ধনে' ও 'মিগে' প্রভৃতি)।

(খ) **এ (য়) বিভক্তি** : আধুনিক বাংলায় অ-কারান্ত শব্দশেষে কর্তায় এ-বিভক্তি রক্ষিত হয়েছে কোন কোন স্থলে। এইরূপ উদাহরণ চর্যাপদের কালেও দেখা যায়। যেমন, কাহ্নে গাই, বাজুলে দিল। প্রবচন বা প্রবচনসদৃশ বাক্যাবলীতে এখনও তা আছে- 'পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়'। এই এ-কারের ইতিহাস নিম্নরূপ।

(১) আধুনিক বাংলায় চলে, ভণে ইত্যাদি, কিন্তু প্রাচীন বাংলায় চলই, ভণই। মাগধী অপভ্রংশেও তাই, যথা- পুত্তই। কিন্তু তার পূর্বরূপ ভিন্ন– পুত্তএ < পুত্তকে < পুত্রকঃ। এর ইতিহাসটি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬) যথার্থ নির্মাণ করেন নি। আসলে এই {এ}-র উৎপত্তি এই পথে হয় নি, অথচ দেখা যায় মাগধী প্রকৃত ও অশোক অনুশাসনে (প্রাচ্য) তা বর্তমান। সেই দৃষ্টে শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব অনুমান করেন এটি সম্ভবত সাদৃশ্যজাত সৃষ্টি। অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সন্ধির কারণে অ+ই=এ কার প্রাচীন বাংলার ব্যাকরণে সম্ভব ছিল না, এটা সম্ভব হয়েছে তৃতীয়া বিভক্তি (এন>এণ>এঁ>এঁ, সকর্মকস্থলে এ [প্রাচীন বাংলা]-র ব্যবহারগত সাদৃশ্য থেকে। ড. শহীদুল্লাহ্‌ (১৯৬৫ : ৯১১) যে ব্যাখ্যা দেন তা এখানে উদ্ধৃত হলো : "প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অতীত ও ভবিষ্যৎকালের কর্ম ও ভাব বাচ্যের প্রয়োগ হইতে এই প্রকার বিভক্তি

আধুনিক বাঙ্গালায় বর্তমান কালের কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে সংক্রামিত হইয়াছে। প্রা, ভা, আ, কৃষ্ণেন দৃষ্টম > প্রা. কণ্হেণ দিটঠং > অপ. কণ্ হেঁ দীঠ > প্রা. বাং, কাহ্নে দীঠা (কাহ্নে দেখিল)। ইহার সাদৃশ্যে 'কাহ্নে গাই' < প্রা, ভা, আ, কৃষ্ণো গাতি।"

(২) সুকুমার সেনের মতে (সেন ১৯৭৯ : ৩৫০) প্রাচীন বাংলায় উক্ত কর্তা হতো বিভক্তিহীন এবং অনুক্ত কর্তায় করণ কারকের বিভক্তি দেখানো হতো :
'প্রাচীন তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত অনুক্ত কর্তা কর্ম ভাববাচ্যের ক্রিয়ার সঙ্গে ব্যবহৃত হইত। যেমন কুম্ভীরে খাঅ (<কুম্ভীরেণ খাদ্যতে); কাহ্নে গাই (<কৃষ্ণেণ গাহিতম)। উক্ত কর্তা বিভক্তিহীন। যেমন, ভণই কাহ্ন।'

(৩) কোন কোনও উপভাগ বিভক্তি-যোগ প্রবণতার বিশিষ্ট ও অভিনব। অনেক ক্ষেত্র. এগুলি আবার পূর্বরূপেরই সংরক্ষণ (Shared Retention) বটে। মধ্যযুগের রূপ তুলনীয়: 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে'; 'না ছাড়ে নন্দের পোএ' ইত্যাদি। ছড়াতেও দেখি : 'না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে'। পূর্ববঙ্গ ও কামরূপীতে এরই অন্য বৈচিত্র্য সাধারণ: 'খোকায় কাঁদে', 'ঘোড়াএ ঘাস খায়' (মহাপ্রাণতার ক্ষীণায়ন সহ), 'বাপ ছেলেতে', 'বাপবেটায়'; 'বাপো-বেটায়', 'ভূতে ধরে', 'ঘোড়াত ঘাস খায়', বা 'তার দ্বারায়' প্রভৃতি এবং অনুসর্গসহ ব্যবহার এর অপর বৈশিষ্ট্য: 'কুপে হইতে', 'তোমার আগে' (তোমাকে অর্থে), 'আঁখির আগে' ইত্যাদি।

৯. উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় ইতিহাসের যে দিকটি বোঝানো হয়েছে তার প্রমাণ সিদ্ধতার বিষয়টি নিরপেক্ষ: কিন্তু তা ব্যুৎপত্তি বোঝালেও তাৎপর্য থেকে তার অবস্থান দূরে থেকেছে। কারকে তিনটি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত আছে যথা, অবস্থান (পদগতধর্ম), সম্পর্ক (ক্রিয়াগত যোজনা) এবং অর্থকূট (এদুয়ের বিচার; ৩য় কক্ষ) এবং তা প্রায় নির্দিষ্ট। কিন্তু এতদভিন্নও উপাদানভেদে এর মধ্যে ঘটে নানা নিপাতন ও অব্যাখ্যেয় (আপাতত:) প্রবণতা, ইতিহাস যেখানে নীরব। অথচ আশ্চর্য এই যে বিষয়টি ঐতিহাসিক প্রপঞ্চ বিশেষ, যদ্বারা এই উপাদানরাশি বিশ্লিষ্ট, বিভাজিত ও বিচিত্র। এইভাবে কারকে প্রবেশ করে আমরা বহু স্তরের বিষয়কে একীভূত আকারে ও উপরিতলের ধর্মে সমগঠনে দেখতে পাই। এতে কেবল নবায়ন স্বরূপে নয়. পূর্বরূপও পুনর্গঠনযোগ্য বলে বিবেচনা করি এবং ব্যুৎপত্তি নির্মাণ করি। ভাষা পরিবারের সদস্য চিহ্নিত করণেব ও আন্তসম্পর্ক বিচারের এই ধ্রুব পদ্ধতিটি শ্রদ্ধেয় বটে. কিন্তু প্রশ্নাতীত নয় নিশ্চয়।

বাংলা বিভক্তিসমূহ নানা শ্রেণীর ও নানারূপের। এদের ঐতিহাসিক পরিচয় বিতর্কিত। কর্তায় বিভক্তি লোপ, অ-নির্দিষ্ট কর্তায় বিভক্তিস্থাপন ('দশে মিলি করি কাজ'), অকারান্ত পদে এ বিভক্তি, অ-কার ভিন্ন পদে এ, য়, এবং তে বিভক্তির ঐচ্ছিক রূপ, অনুক্ত কর্তায় করণ কারকের এঁ (এন-জাত) এবং সকর্মক রূপে এ বিভক্তির নিরপেক্ষতা লাভ (neutralisation) ও তীর্যক ব্যবহার (oblique) কিংবা অধিকরণ ও করণের সমীকরণ হয়ে কর্তার সাথে একীভবন (চর্যাগীতি: 'সুখদুখেতেঁ', সুখদুখের দ্বারা) এবং আরো বিচিত্র রূপে বাংলা কারকের পরিচয় বা বিভক্তি চিহ্নের গঠনরূপ ও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ সবই বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য (Innovation) এবং তা ঐতিহাসিক অনুক্রমে ও সৃজনশীল প্রতিরোধধর্মে (Creative Resistance) অর্জিত। কিন্তু সনাতন আলোচনা কেবল ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধানে লিপ্ত বলে যা প্রাচীন (old fashioned) শ্রেণীকরণীতত্ত্বে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত।

আধুনিক গবেষণায় ও তথ্যের পরিপূরকতার ফলে পুনর্গঠনতত্ত্ব ফাঁক পূরণের একটি মধ্যবর্তী প্রয়াস ছিল। আজ RG, ECP প্রভৃতি পরবর্তী অগ্রগতিসমূহ ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের জটিল বিষয়ের ('historical puzzles') বিশ্লেষণে এক নবতর সংযোজন। বাংলা কারকচিহ্নে আমরা যে জটিলতা, বহুধর্মিতা ও অন্যান্য বিষয় লক্ষ্য করি, সে সব সহ বাংলা ভাষার দীর্ঘকাল অবহেলিত এলাকাগুলিতে এই পরিপূরক নতুন আলোচনা আলো ফেলতে এবং পুনর্গঠনতত্ত্বের লক্ষ্য অর্জনে তথা পরিপূর্ণতা দানে সহায়ক সূত্র হতে চলেছে। পূর্বোক্ত নব্যধারার সূত্র (রেফারেন্স)-গুলি থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে সক্ষম হই যে উৎপাদনশীল ঐতিহাসিক রূপতাত্ত্বিক-বাক্যতাত্ত্বিক (Generative historical morpho syntax) জ্ঞানের প্রয়োগ পরিশ্রম স্বীকার করে আগামীতে এই গৃহীত উপাদানের ওপর নবতর গবেষণার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারবে; তার সেই স্বর্ণশীর্ষ দ্বার উন্মোচিত হলে বাংলা ভাষা কম লাভবান হবে না। বাংলা ভাষার শাখায়ন (গৌড়ী অথবা মাগধী) ও অন্যান্য ঐতিহাসিক শ্রেণীকরণ সমস্যাসহ যাবৎ ভাষিক নিরূপণসমূহের পুনর্বিচার ও যথার্থ রূপাঙ্গের পুনর্গঠন আজ জরুরী হয়ে উঠেছে। বাংলা কারক-চিহ্নের ব্যাকরণ বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের এ চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে আশা করি। কেননা এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে ভাষা উপাদান কখনও ইতিহাসের এক স্তরের মধ্য দিয়ে রৈখিক বিবর্তনের ফলস্বরূপ বিস্তার লাভ করে না। অতএব তার এক-সমতলী বিচার অবশ্যই একপক্ষীয় ও রক্ষণশীলতার পরিচায়ক এবং তা আধুনিক চিন্তার পরিপন্থী।

টীকা

১. এই আলোচনাংশে যে সব তত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে বাহুল্য বিধায় তার বিস্তারে যাওয়া হয় নি; উৎসাহী পাঠক J. Clackson 1994 গ্রন্থে তার কিছু পরিচয় পাবেন।

২. দ্বিবচনে সর্বত্র বিভক্তি সংখ্যা তিন। কিন্তু বহুবচনে ছয়টি। পরিবর্তন কালে বহুবচনে আবার ১মা-২য়ার ভেদ লোপ হতো এবং ৫মী অর্থে তৃতীয়ার ব্যবহারও হতো।

৩. মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তরে এই বিভক্তি লোপ গুরুত্ব পায় এবং বাক্যে অন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে শুধু পদসংস্থানই (arrangements) নয় সামগ্রিক অর্থও বিবেচ্য হতো। ফলে কর্তা (এবং কর্ম) নয়, অনেক সময় করণ-অধিকরণেরও সমরূপ ঘটেছে। যেমন, 'আকাট পণ্ডিত ভ্রান্তিতে নষ্ট' অর্থে 'অকট পন্ডিঅ ভন্তিঅ নাসিঅ।' এই পদে 'ভন্তিঅ' কর্ম নয়, অর্থানুসারে তা করণ অথবা অধিকরণ। (দ্রষ্টব্য, সুকুমার সেন ১৯৭৯ : ১৪৮)

সূত্র নির্দেশ

মনিরুজ্জামান

১৪০০ সাল : 'বাংলা সংস্কৃত ও ইন্দো-ইউরোপীয় : সম্প্রসারিত ঐতিহাসিক পুনর্গঠনতত্ত্বের ব্যবহার প্রসঙ্গ'। সাহিত্য পত্রিকা ৩৭ বর্ষ ২য় সংখ্যা। (ঢা. বি.)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

১৯৬৫ : বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত। ঢাকা, ২য় সংস্করণ।

সুকুমার সেন

১৯৭৯ : ভাষার ইতিবৃত্ত। কলিকাতা, ১৩শ সংস্করণ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯২৬ : The Origin and Development of the Bengali language, Calcutta

B. Comric (Ed.)

1987 : The world's Languages, London

Jarnes Clackson

1994 : The Linguistic Relationship between Armerian and Greek. Oxford

John Beams

1871 : A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India. New Delhi (2nd Edition, 1970)

M.H. Klaiman

1987 : 'Bengali', in Comrie (1987)